# বন্ধন - মুক্তির

শাঁওলী রায়

সঙ্গীত ইছামতি। এক ঝলকে তা যেমন স্মৃতি থেকে রঙিন দিনগুলোর স্বপ্নমাখা আবেগকে জাগিয়ে তোলে অন্যদিকে সঙ্গীতই পারে মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে দিতে। হঠাৎ করে গানের সুরে ভেসে ওঠে এক-একটি দৃশ্য। মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই ভালোলাগার মোড়কের মধ্যে। স্মৃতি সুখের হোক বা না হোক সুর যতক্ষণ সূত্রধরের ভূমিকায় থাকে, মনকে বশ করতে তার সময় লাগে না। সঙ্গীতের জাদুকাঠির সম্ভাবনা এই সুরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। আর এই কারণেই বোধহয় জীবন সৃষ্টির প্রথম থেকে সঙ্গীত জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। অবিস্মরণীয় কাল থেকে মানুষ যখনই খাদ্য-বস্ত্রের ন্যূনতম চাহিদা মিটিয়ে নিতে পেরেছে তখনই তার মন মাতিয়ে নিয়েছে সুরে-ছন্দে সঙ্গীতে। সঙ্গীত - তাতো প্রকৃতিতে মিলে মিশে ছিলই। মানুষ তাকে প্রতিস্থাপন করেছে একটি স্থিতিস্থাপক কালখণ্ডে।

ভারতবর্ষের সঙ্গীতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ধর্মাচরণের জন্য সঙ্গীত ব্যবহৃত হতো। যদিও তা ছিল স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান সঙ্গীতের রূপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের রূপের পরিবর্তন হয়েছে। এরই সাথে ভারতবর্ষে ঘটেছে নানা সভ্যতা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। সঙ্গীতও সেই অভিঘাতে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত হয়েছে। বর্তমানে যে সঙ্গীত ধারা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হিসেবে চিহ্নিত, এই সঙ্গীত শৈলীও পরিবর্তিত ইতিহাস ও তার সংস্কৃতির আবহকে বহন করে নিয়ে চলেছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে রূপ প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল অর্থাৎ ধ্রুপদ, ধামার অথবা সঙ্গীত পরিবেশনের যে শৈলী ছিল তা দিনে দিনে পরিবর্তিত হতে থাকে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। রাগরাগিণীর শ্রেণী বিভাগের মতান্তরে ইতিমধ্যেই দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতি, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি দুটি পৃথক রাস্তা নেয়। এরপর চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতীয় রাগসঙ্গীতকে নতুন সম্ভাবনায় ভরিয়ে তোলেন আমীর খুসরো। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মুখ্য উপাদান রাগ। তার মধ্যেই নিহিত আছে সুরের নির্যাস। সেই রাগপদ্ধতির মধ্যে ফারসী সোক্কাম পদ্ধতির হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে এলেন আমীর খুসরো। ফলে বিনির্মাণ হলো উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এবং সমৃদ্ধ হলো তার রূপ ও রস। বর্তমান আলোচনার বিষয়ের নির্মাণও এখান থেকেই। সঙ্গীতের ইতিহাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে দেখা যায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গঠন হয়েছে ঠাট - রাগ - জাতি -পরিবেশনের সময় - রসসৃষ্টি এবং পরিবেশনের নির্দিষ্ট শৈলী (ধ্রুপদ - ধামার - খেয়াল পরিবেশনের নির্দিষ্ট ধারা) এমন অনেক বিষয়ের সমন্বয়ে। শুধু তাই নয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য শিল্পীকেও তৈরী হতে হয় বহুদিনের সাধনালব্ধ উপলব্ধি দ্বারা। এতগুলি নিয়মের নিগড় থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত দ্বদ্বার নয়। অরূপ সঙ্গীত যে মুহূর্তে শিল্পীর প্রাণ দিয়ে রূপ পায় সুরে ছন্দে, ভরিয়ে তোলে মন-প্রাণ, অনুভূতি ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের নিভৃতে। এই কারণেই দীপকের উত্তাপ মল্লারের সরস বারিধারায় নির্বাপিত হয়েছিল--এমন কিংবদন্তীকেও যেন মন বিশ্বাস করতে চায়। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শাস্ত্র এবং উন্মুক্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস এই দুই পাড়ই পরস্পর সমান্তরাল চলেছে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনার প্রথমেই আসে রাগের কথা। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে রাগের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"। এই রাগের ধারণাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যাবতীয় অন্যান্য বিষয়গুলি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে রাগ পদ্ধতি চতুর্দশ শতাব্দীতে নতুন রূপে নির্মিত হয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে "রাগ" বিষয়টির মধ্যেই আছে সঙ্গীতের যাবতীয় আবেদনের আকর্ষণ। সংজ্ঞানুসারে রাগের অর্থ হচ্ছে যা রাঙিয়ে তোলে, অথবা রাগ একটি অনুভব তরঙ্গকে উপস্থাপিত করে। কয়েকটি স্বরের সঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান এক-একটি রাগের রূপ তৈরী হয়। সুরগুলির ক্রমাবস্থানের পরিবর্তনে রাগরূপও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বলা যায় র

াগের রূপ বিন্যাসেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যাবতীয় নিয়ম আবর্তিত হচ্ছে।

মৌলিক কতকগুলি বিষয় থেকে রাগরূপ তৈরীর কাঠামো অবধি আলোচনায় দেখা যায়, আলোচনার প্রথমে আসে সাত সুরের কথা। সাতটি শুদ্ধ স্বর, চারটি কোমল স্বর, একটি তীব্র স্বর এবং সাতস্বরের অন্যান্য শ্রুতিগুলিকে নিয়ে তৈরী হয়েছে সঙ্গীতের প্রাথমিক কাঠামোটি। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে মাত্র তিনটি স্বরের ব্যবহার হতো। উচচাঙ্গ তথা জটিলতর সঙ্গীতের অন্য আর একটি মাত্রা হচ্ছে এই স্বর সংখ্যা বৃদ্ধি। শুদ্ধ-কোমল-কড়ি স্বরের নানা বিন্যাসে তৈরী হয়েছে ঠাট বা কাঠামো। এই ঠাটই হচ্ছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ নির্মাণের মৌলিক একক। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ঠাটের সংখ্যা হচ্ছে দশটি। বিলাবল, কাফী, খাম্বাজ, কল্যাণ, মারোয়া, পূরবী, আশাবরী, ভৈরব, ভৈরবী, তোড়ী। এবং এ যাবৎকাল অবধি যত রাগ তৈরী হয়ে আসছে, তাদের প্রাথমিক বিন্যাসটি তৈরী হয় এই ঠাট থেকেই। রাগ নির্মাণের আর একটি বিষয় হলো সঠিক রাগ রূপ গঠন করা অর্থাৎ একই ঠাট থেকে জন্ম নিতে পারে অসংখ্য রাগরূপ। এই রাগরূপ তৈরী হয় বাদী-সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী স্বরের ব্যবহারের তারতম্যে নির্ভর করে। অর্থাৎ একই ঠাটের আধারেই স্বরের ব্যবহারের প্রাধান্যের উপর রাগ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর রাগরূপ তৈরী হয় স্বরসঙ্গতির উপরে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাকরণে স্বরসঙ্গতি হলো সেই স্বরবিন্যাস, যার মধ্য দিয়ে এক একটি রাগের রূপভেদগুলি অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠে। বলা যায় স্বরসঙ্গতি সেই রঙের সমাহার যার মধ্যে দিয়ে রাগের পার্থক্যগুলি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। একথা তো সর্বজনমান্য যে, রাগের প্রকারভেদের সঙ্গে প্রকৃতির ঋতু এমনকি প্রহরের পরিবর্তনের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। (যদিও এ বিষয়ে বহু মতান্তর আছে। তবে নারদের সঙ্গীত মকরন্দ গ্রন্থে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় যে রাগের পরিবেশনের সঙ্গে ঋতু এবং দিনের প্রহরের পরিবর্তনের যোগাযোগ আছে)। স্বরসঙ্গতি দ্বারা রাগের যে রূপ পাওয়া যায়, সেই রূপগুলি পরিবর্তিত সময়কালে আরও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আলোচনা করা যায় কতগুলি রাগ নিয়ে। এদের প্রত্যেকটিই একই ঠাট থেকে রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। ঠাটটি হলো তোড়ী। এর থেকেই তৈরী হয়েছে মিঞা কি তোড়ী, গুর্জরী তোড়ী, মধুবন্তী এবং মূলতানী । অথচ স্বরসঙ্গতি আর রাগের চলনের প্রকারভেদে রাগগুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকের থেকে ভিন্নতর হয়ে উঠেছে।

আপাত দৃষ্টিতে রাগ চারটির আরোহ অবরোহে যেটুকু পার্থক্য দেখা যায়, রাগ পরিবেশনের সময় দেখা যায় রাগগুলির নির্মিত ভাবের দুস্তর ব্যবধান। প্রত্যেকটি রাগেই ঋষভ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ঋষভের স্বরস্থানের পার্থক্যের জন্য প্রত্যেকটি রাগেই নতুন নতুন স্বররূপ এবং আবহ সৃষ্টি করে। এবং সেই বিশেষত্বগুলি রাগের পরিবেশনের নির্দিষ্ট সময়ে আরও অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক, তোড়ী এবং গুর্জরী তোড়ী দু'টিই ভোরের রাগ। আবার মধুবন্তী এবং মূলতানীর পরিবেশনের সময় হলো দুপুর বেলা। তোড়ী বা গুর্জরী তোড়ীর মধ্যে যে শান্তভাব আছে, মধুবন্তী ও মূলতানীতে পরিবেশিত রস কিছুটা তীব্র। এ প্রসঙ্গে নারদের সঙ্গীত মকরন্দে একটি আলোচনা পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, যথোপযুক্ত সময়ে রাগ পরিবেশিত না করা হলে সুরের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এবং যারা সঙ্গীতের শ্রোতা তারা দারিদ্র্যের সম্মুখীন হবে, এমনকি তাদের মৃত্যুও ত্বরান্বিত হবে।

এবারে রাগ থেকে রাগের দ্বারা রস নির্মাণের আলোচনায় চলে যাওয়া যায়। পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগগুলি এক-একটি ভাবনার রূপমাত্র। এবং সেই ভাবনাগুলিই অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠে এক-একটি রস নির্মাণের মাধ্যমে। এক একটি ভাবনা থেকে এক-একটি রসের উৎপত্তি। যে কোন নন্দন শিল্পের মতো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধ্যমেও রস উপাদান নির্মাণ একটি স্বভাবজ প্রক্রিয়া। প্রত্যেকটি রাগেরই একটি নিজস্ব যেমন রূপ আছে তেমনই আছে একটি মুখ্য রসকেন্দ্র । এরপর সেই রসকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য অনুগামী রসগুলিও আবর্তিত হয়। যেমন আলোচনা হচ্ছিল মিঞা কি তোড়ী, গুর্জরী তোড়ী, মধুবন্তী এবং মূলতানী নিয়ে। এই চারটি রাগের নিঃসৃত রস আলোচনাতেও দেখা যায় তোড়ী এবং গুর্জরী তোড়ী ভোরের রাগ হওয়ার জন্য এদের মধ্যে শান্ত নির্ভার নিবেদনের সুর ধবনিত হয়। সকালের নরম আলো, নতুন দিন শুরু হওয়ার কোমলতা এবং প্রত্যাশা ধবনিত হয় তোড়ীতে, গুর্জরী তোড়ীতে। এবং দিন ক্রমে বাড়তে বাড়তে মধ্যাহ্নে পৌঁছালে তার মধ্যে যে তীব্রতা, দিনশেষের রিক্ততা-সেই অনুভব জাগায় মধুবন্তী এবং মূলতানী।

অর্থাৎ বলা যায়, একটি নিটোল কাঠামোর মধ্যে থেকেও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে নির্যাস, তার দ্বারা নির্মিত হয় একটি অপূর্ব অবয়ব। সেই অবয়বটি আবার অনুভব করার মতো, সঙ্গীত তো একটি ধারণা মাত্র, তাকে না যায় ধরা, না যায় ছোঁয়া, কিন্তু যে মুহূর্তে শিল্পী তাকে কণ্ঠে ধারণ করেন এবং তাঁর অনুভূতি দিয়ে বর্ণময় রূপময় করে প্রকাশ করেন তখন সেই র পতরঙ্গ প্রতিফলিত হয় শ্রোতার হৃদয়ে। ভূপালী রাগে বাঁধা একটি অপূর্ব ধ্রুপদের বাণীতে পাওয়া যায়--

সপ্তসুর তিন গ্রাম
একইশ মুরছ না
গাওয়ত গুণীজন
এতহি সঙ্গীত প্রমাণ ।।

সঙ্গীত যতক্ষণ শাস্ত্রের বাঁধনে বাঁধা থাকে ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। সেই অধরা মাধুরীকে মুক্তি দেন গুণী শিল্পী। সঙ্গীত তখনই সার্থক হয়। রবিঠাকুরের কথায় "বস্তুত, যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না, এবং হাস্যের ভিতরক ার হাস্যটিধবনিয়া উঠে না, সেইখানেই সঙ্গীতের প্রভাব। সেইখানে মানুষের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়, সেখানে আমাদের সুখ-দুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদী-নির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিহৃদয় সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।" (অন্তর-বাহির)

সঙ্গীতের এই বিশালতা, এই সমগ্রতার যে ছবি তা বোনা হয় সুরের তুলি দিয়ে। সঙ্গীত বিষয়টিই অবাধ মনের, উন্মুক্ত প্র াণের উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। সেখানে শাস্ত্রের বাঁধন থাকুক, তাতে মন মানে না। আবার সেই সঙ্গীত গুর চিন্তা স্মরণ করে বলা যায় "... নিজের সৃজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশী দরকার" (আমাদের সংগীত)। ------ ---এই শিক্ষা এবং সংযমশক্তির তালিম দেয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। সুরের রঙে, তোড়ীর সদ্যপ্রস্ফুটিত নরম আলো থেকে মধুবন্তী, মূলতানীর দীপ্ত মধ্যাহ্নের আবহরচনার যে সূত্র তাকেই ধারণ করে আছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। অর্থাৎ এই শাস্ত্র সঙ্গীতের কণ্ঠরে াধ করার জন্য, পদে পদে শৃঙ্খলার নিষেধাজ্ঞা জারী করার জন্য নয়, বরং সঙ্গীতের উড়ান যাতে আরো সফল হয়, সৃষ্টি যেন আরও উদ্ভাসিত হয় সেই লক্ষ্যকেই আরও মজবুত করে এই শাস্ত্র।